Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 166 - 173
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শিকড়ের গল্প : গল্পের শিকড় - 'শকুন'

রুদ্রদেব মন্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ
Email ID: devrudra1991@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Roots, Uprooted, Germination, A fragmented being, Adolescence, Rugged terrian, consciousness, Heartache, Exploration.

Abstract

Literature is a mirror of life. Stories related to life are reflected in the world of literature. Just as the story of life is the root of the story of literature, so is the root of every life. Germination is the birth of life. As life grows, those roots become stronger. Life is uprooted from life when life is cut off from its roots. A rootless nation like Bengali is rare in the world, the heartache of searching for the roots of this fragmented being has been expressed in the pages of literature, one of the mirrors of life.

Hasan Azizul Haq the traditional story writer of Bengali literature, uprooted from the roots of his life and realized the pull of those roots at the root of life. From that realization, he walked on the rough ground of dusty childhood and adolescence through literary works. Literature may have been used as a tool to fulfill the desire to return to the roots, and the story of the roots has been used as a tool for literature. The root story is the basis of his story. He derived the plot of his first story from a tragic incident in the rugged terrain of Raar. The soil where the writer spent his childhood and youth, the soil where the roots of the writer are said to be, brings the scent of that soil to our consciousness in the pages of his written literature. How the fragmented experience of his own life is recorded on the pages of his written stories, how the scent of the roots is spread in the fresh air of his writing, we will see how the story of the roots has become the root of the story.

Discussion

> "আমি সাধ্যমতো বিচার করে দেখেছি, কল্পনা, উদ্ভাবনা-শক্তি, আমার প্রায় নেই-ই, গল্প লিখতে বা বলাতে কোনো কুশলতাও নেই। আধুনিক গল্প তখনও যেহেতু গড়া হয়নি, সেজন্য বাংলা গদ্য, গল্পের ভাষা কেমন বদলিয়েছে, বদলাচ্ছে, আধুনিক মনোভাবই বা কি, সাহিত্যের একটা শাখা হিসেবে ছোটগল্প কোথায় পৌঁছেছে, শুরু করার সময় এইসবের প্রায় কিছুই জানা ছিল না। আমি নির্ভর করেছি জীবনযাপনের হাড়-কাঠামোর ওপর।" - 'ছোটগল্প আছে, নেই'; হাসান আজিজুল হক

সাহিত্য জীবনের দর্পণ। জীবনের সঙ্গে জড়িত গল্পই সাহিত্যের জগতে প্রতিবিম্বিত হয়। জীবনের গল্প যেমন সাহিত্যের গল্পের শিকড়, তেমনি প্রত্যেক জীবনের মূলে প্রোথিত থাকে শিকড়। জীবনের জন্মলগ্নেই যার অঙ্কুরোদগম। জীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সেই শিকড়ের মূল দৃঢ় হয়। জীবনের মূলে প্রোথিত সেই শিকড় থেকে জীবনকে ছিন্ন করে দিলে জীবনকে জীবন থেকেই উৎখাত করা হয়। বাঙালির মত শিকড় ছেঁড়া জাতি পৃথিবীতে বিরল। এই ছিন্নমূল সত্তার শিকড়ের অনুসন্ধানে হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত হয়েছে জীবনের অন্যতম দর্পণ সাহিত্যের পাতায় পাতায়।

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। তাঁর জীবনের শিকড় থেকে উৎখাত হয়ে সেই শিকড়ের টান তিনি জীবনের মূলে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি ধুলিমাখা শৈশব কৈশোরের রুক্ষ মাটিতে পদচারনা করেছেন সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়েই। শিকড়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেপূরণের হেতু হিসাবে হয়তো সাহিত্য রচনাকেই হাতিয়ার করেছে, আবার সাহিত্য রচনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে শিকড়ের গল্পকেই। শিকড়ের গল্পই তার গল্পের ভিত বা বুনিয়াদ। তাঁর রচিত প্রথম গল্পের প্লট তিনি আহরণ করেছেন রাড়ের রুক্ষ মাটিতে সংঘটিত এক মর্মান্তিক ঘটনা থেকেই। যে মাটিতে অতিবাহিত হয়েছে লেখকের শৈশব কৈশোর, যে মাটিতে প্রোথিত আছে লেখকের শিকড়ের মূল, তাঁর রচিত সাহিত্যের পাতায় সেই মাটির ঘ্রাণ আমাদের চেতনায় সুপ্তি আনে। তাঁর নিজের জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ তাঁর রচিত গল্পের পাতায় কিভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার লেখনীর টাটকা বাতাসের পরতে পরতে সেই শিকড়ের ঘ্রাণ কিভাবে ছড়ানো রয়েছে, তারই অনুসন্ধানে ধাবিত হয়ে আমরা দেখব কিভাবে তাঁর শিকড়ের গল্প গল্পের শিকড় হয়ে উঠেছে।

পৃথিবী জোড়া অনিশ্চয়তা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, ধর্মান্ধতা ও রাজনৈতিক আদর্শহীনতার এক অস্থির পরিস্থিতিতে মানবজাতি আজ অস্তিত্বের সংকটে। পৃথিবী জোড়া দুই বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এই মারন যজ্ঞের হোতা। এই মারণ যজ্ঞের প্রাকলগ্নে জন্মগ্রহণকারী হাসান আজিজুল হকের সামগ্রিক জীবন জুড়েই যে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রাধান্য লাভ করবে সেটাই স্বাভাবিক। যে সময় ও সমাজে লেখক জীবন যাপন করেন সেই সমকালীন সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতাকে তার রচনার মধ্যে উপস্থাপন করে সেই সময়ের ভোক্তা হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার ঋণ পরিশোধ করে থাকেন লেখক। লেখকের এই দায়বোধ মানবজাতির কাছে, আরও বৃহৎ অর্থে আপন দেশ ও কালের কাছে। বিকারগ্রস্ত মানব অস্তিত্বকে সংগ্রামের কর্মযজ্ঞে শামিল করার হোতা লেখক নিজেই।

বিংশ শতকে সংঘটিত দুটো বিশ্বযুদ্ধ ইহজাগতিক পৃথিবীর ক্ষয়-ক্ষতি প্রাণ-হানির পাশাপাশি মনোজাগতিক দুনিয়ায় ব্যাপকতর পরিবর্তন সহ মূল্যবোধের খোলনলচে উলটপালট করলেও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথিবীকে দান করেছে ভিন্নতর সব তত্ত্ব। কিন্তু বাঙালির জীবনে দেশভাগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও সৃষ্টি করেছে এক গভীরতর ক্ষত, জন্ম দিয়েছে এক বৃহত্তম ট্রাজেডি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ এইসব মিলিয়ে বাঙালির জীবনে গভীর সামাজিক ও ব্যক্তি সংকট তৈরি হয়। দেশভাগের ফলে উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু দিশেহারা বাঙালি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এই দেশবিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাঙালির আভ্যন্তরীণ বিকার, ব্যাধি, অসঙ্গতি জটিলতা, এবং গলিত পচনশীল সমাজে ব্যক্তির অসহায়তা ও অস্তিত্বহীনতা থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ও নতুন স্বপ্নের বীজ বপনের সৃষ্টিকর্তা হাসান আজিজুল হক।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যে ভিত্তিহীন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাঙালির হৃদয়ে কাঁটাতার গেঁথে দেওয়া হয়েছে সেই কাঁটাতারের বেড়ায় বাঙালি জাতির ছিন্নমূল সত্তার শিকড়ের অনুসন্ধানের অন্যতম প্রাণপুরুষ হাসান আজিজুল হক । জীবনের সামগ্রিক রূপকে প্রত্যক্ষ করে তিনি উপলব্ধি করেছেন –

> "আমাদের সমাজের মধ্যে যে বিকট অমানবিকতা, পাকাপোক্ত নিষ্ঠুরতা এবং পাশবিকতা আছে, স্যাঁতসেঁতে ভিজে হৃদয় নিয়ে তার সম্মুখীন হওয়া কোন লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়।"[১]

এই অমানবিক সমাজব্যবস্থার মূলকে ছিন্ন করতে, মানবিক লেখক হাসান আজিজুল হক নিষ্ঠুর শল্যচিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যে সমাজ কাঠামোর সন্ধান পেয়েছেন তা দিয়েই তিনি বহতা সময়ের দলিল তৈরি করেছেন। ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার দ্বি-বাচনিকতা হাসানের কাছে অনুভবগম্য সত্য। এই সত্যের পৌনঃপুনিক উত্তরণই তার লেখার আধেয়।
জীবনে ও সাহিত্যে ব্যাপ্ত বিদূষন ও বিকারের স্বরূপ সন্ধানে তিনি উপলব্ধি করেছেন –

> "দেশ ডুবে থাকে অন্ধকারে, কাদায় পাঁকে; অন্য দিকে উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে রাজধানী, পিচ ঢালা চওড়া রাস্তায় বিদেশ থেকে আমদানি করা গাড়ি উলঙ্গ মানুষের উপর আলো ফেলে নিঃশব্দে চলে যায়। বুদ্ধি নেই, মনন নেই, শিক্ষা নেই, বিবেচনা নেই, নির্মাণ ও সৃষ্টি নেই - আজ শুধু অবিরল বাক্যস্রোত। তাতে আর জীবন জাগে না, হাত কাজ খুঁজে পায় না, মস্তিষ্ক তোষামোদ আর উঞ্ছবৃত্তিতেই আপন ক্ষমতা ফুরিয়ে ফেলে । জনজীবনে আজ সুবিশাল চরা।"[২]

সেই অন্ধকার পটভূমি তার গল্পের প্রেক্ষিত। সমাজ ও ব্যক্তি সত্তার এই উলঙ্গ নগ্ন রূপ দেখে লেখকের ধারণা "দেশের অবস্থা হচ্ছে গলায় গামছা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার মত।"[৩] একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে এরকম পরিস্থিতিতে সমাজের অন্ধকার দূরীকরণের দায়ভার বহনের ব্যর্থতা থেকে লেখকের মনে এক অপরাধবোধ জন্ম নেয় আর সেখান থেকেই লেখকের মনে হয়েছে –

> "লেখার আয়নায় আমার সময়কালের দেশ সমাজ পৃথিবীর বাস্তবতার কিছু মাত্র প্রতিফলন যদি ঘটাতে পারি, তাতে হয়তো এমন শক্তির উদ্বোধন ঘটবে যাতে শ্রম ও উৎপাদনের ফলের মত কোন প্রত্যক্ষ ফল ফিরিয়ে দিতে না পারার সংকোচও খানিকটা কেটে যাবে।"[৪]

সেই সংকোচ নিবারণের, অন্ধকার দূরীকরণের উপায় হচ্ছে সাহিত্য। কারণ সাহিত্যিকের হাতের অস্ত্রটি সবচেয়ে জোরালো। সেই অস্ত্রের নিখুঁত প্রয়োগে মানব জীবনকে ফালাফালা করে তার প্রত্যেকটি শিরা উপশিরার যথাযথ ব্যাখ্যা তিনি মেলে ধরতে পারেন। আবার সেই অস্ত্রেরই নিখুঁত ছোঁয়ায় তিনি মানবসত্তার পূর্ণ বাস্তবতার অবয়ব স্পষ্ট রেখায় এঁকে দিতে পারেন। তাই সাহিত্যেই জীবনের সামগ্রিক রূপ পরিলক্ষিত হয়। "স্পষ্টতর ছবি আঁকায় বড় কথা নয় খবরের কাগজেও জীবনের ছবি পাওয়া যায় বৈকি, সাহিত্যিকের কাজ আরেকটু বেশি।"[৫] সেই অঙ্গীকারবদ্ধতার ফলস্বরূপ তার সাহিত্যে পদার্পণ।

ক্ষয়িষ্ণু, বিবর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় পচনশীল ব্যক্তি সত্তার স্বরূপকে রূপ দিতে গিয়ে কথাকার হাসান আজিজুল হক জানিয়েছেন –
"বিশ্লেষণ ছাড়া যে পূর্ণের স্বরূপ মেলে না, দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য যে জীবন যাপনের মূলে প্রোথিত, গতি ও স্থিতি যে সমাজের কাঠামোয়, আর মানুষের স্বভাবে মৈত্রী ও সংগ্রামের প্রবণতা যে ক্রমান্বয়ে বদলিয়ে চলে এবং সাহিত্য মানেই যে কৌশলে মানুষকে হাজির করা নয় বরং জীবনের জটিল কুটিল অষ্টাবক্র স্বরূপকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা–"[৬] জীবনের জটিল কুটিল অষ্টাবক্র স্বরূপ তুলে ধরার জন্য মধ্যবিত্ত বর্গ যে একমাত্র আশ্রয় ভূমি নয় হাসানের গল্পবিশ্ব তার চমৎকার দৃষ্টান্ত। বাঙালি সমাজের অন্ধকার ও ধূসর নিচু তলায় জীবন যাপনের যে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য গতি ও স্থিতি রয়েছে তার বিচিত্র অনুপুঙ্খ গ্রন্থনার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে তিনি বাস্তবের ভেতরকার টানা পোড়েনকে গল্পের আধেয়তে রূপান্তরিত করেছেন।

'কথাসাহিত্যে গ্রামীণসমাজ' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন যে-

> "গ্রামসমাজ ভেতরে ভেতরে পচে ঢোল হয়ে গেছে, যার শিল্প- সংস্কৃতি কবে বিকিয়ে গেছে কানাকড়ির দামে, শাসনে পীড়নে নাভিশ্বাস উঠে আসছে, সেই গ্রামসমাজের ছবি সাহিত্যে একরকম গরহাজির থেকে গেল।"[৭]

সেই হতাশ অভিব্যক্তির বহিঃস্ফুরণ ঘটাতেই হয়তো তাঁর কথাসাহিত্যে পদার্পণ।

> "ষাট সালের গরম কালের দিনে দরজা-জানলা বন্ধ। আধো-আঁধার একটা ঘরে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে কবিতা লেখার খাতাটার মাঝখানের পাতাগুলোতে দুদিন না তিনদিন ধরে মনে নেই, একটা ত্রিমাত্রিক নিরেট ঘটনাকে ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করলাম। লেখাটার নাম দেওয়া হলো 'শকুন'। যারা পড়লেন তারা একে বললেন ছোট গল্প।"[৮]

লেখকের এই আত্মবিবরণী থেকেই বোঝা যায় কবিতা রচনার সুপ্ত চেতনা থেকেই সাহিত্যিক অভিব্যক্তি ঘটলেও, তাঁর স্বাচ্ছন্দবোধ বিচরণের প্রতিভাষ্য কথাসাহিত্যই। কারণ তিনি মনে করেন কথাসাহিত্যের দর্পনেই মানব জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রতিবিম্বিত হয়।

'সমকাল' পত্রিকায় ১৯৬০ সালে 'শকুন' গল্পটি প্রকাশ পায় অর্থাৎ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের নিরন্ত্র শাসনকালে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও শোষণে এবং জোতদার, মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রান্তকায়িত সমাজের বালকদলের দলবদ্ধ প্রয়াসে যে নব স্বপ্ন বা আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে তা অবশ্যই সাহিত্যের অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু গল্পের অন্তিম পর্যায়ের সন্ধিক্ষণে এসে গল্পকার আমাদের জীবনে বাস্তবের যে নিষ্ঠুর অভিঘাত এনেছেন তা অতিক্রমের কোন ক্রম জীবন খুঁজে পায় না বাস্তবের কঠিন ভূমিতে দাঁড়িয়েও জীবন যে স্বপ্ন দেখে তা অবশ্যই জীবনের বাঁচার রসদ কিন্তু সেই স্বপ্ন জীবনকে বাঁচার উপায় বলে দিতে পারে মাত্র; জাদুর কাঠি বুলিয়ে বাস্তবকে ভুলিয়ে দিতে পারে না। বাস্তব কঠিন সত্য। স্বপ্নের লেহনে অবগাহন করে সেখান থেকে মুক্তি মেলে না। বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়েই জীবনের সংগ্রাম, স্বপ্নলোকে নয় । যেহেতু জীবন বাস্তবমুখী, সাহিত্য জীবনমুখী;

> "কথা সাহিত্যের কাজ তাই জাদুর কাঠি বুলিয়ে বাস্তবকে ভুলিয়ে দেওয়া হতে পারে না; বরং তার পালন করা উচিত শল্যচিকিৎসকের নিষ্ঠুর নিস্পৃহ ভূমিকা।"[৯]

সন্ধ্যার পটভূমিতে সজীব অন্ধকারের মত এক শকুনের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়েই গল্পের সূত্রপাত। বালক দলের হাতে নির্যাতিত শকুনটি অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করে। বালক দলের নির্যাতন স্বীকার করে সে তাদের বিনোদনের শিকার হয়। শকুনটি নিয়ে তারা কি করবে সেই ভবিষ্যৎ পন্থা সম্পর্কে বালক দল সন্দিহান। শেষ পর্যন্ত বালক দলের হাতেই শকুনটির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গল্পের এই সামান্য আখ্যান বিশেষ ক্ষেত্র জুড়ে অধিষ্ঠিত হলেও গল্পটি ব্যঞ্জনাধর্মী অর্থবহ রূপ লাভ করে শকুনটির মৃত্যুর পরেই। শকুন নিধনের পর ঘরে ফেরার মুখে কাদু শ্যাখের রাঁড় বুন ও জমিরুদ্দিকে দেখে বালক দলের যাত্রাপথ পরিবর্তনের সাথে সাথেই গল্পের অভিমুখও নতুন বাঁক নিয়েছে। বাড়ি ফিরে এই বালক দল গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপরই দেখা যায় দিনের চড়া আলোয় ঝাঁকে ঝাঁকে আগন্তুক শকুনের দল অর্ধস্ফুট মানব শিশুর লোভে উন্মত্তের মতো ধাবমান। দিনের চড়া আলোয় পূর্ববর্তী স্বপ্ন জড়িত ঘটনার ক্ষেত্র ত্যাগ করে পাঠক যে ভাগাড়ে উপনীত হয় সেখানে আমাদের বিবর্ণ ফ্যাকাসে হৃদয়েও রক্ত ক্ষরিত হয়। গল্পের এই দুটি প্লটের একটি স্বপ্নজড়িত, আর অপরটি চূড়ান্ত বাস্তবের ক্ষেত্র। বাস্তবের অনাকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন লেখক বালকদের হাতে শকুনের এই হত্যার মাধ্যমে পূরণ করেছেন। শোষক শ্রেণীর প্রতীক শকুন নিধন লেখকের মানস কল্পনায় জাত হলেও শোষক শ্রেণীর প্রতীক এই শকুনের বিরুদ্ধে বালক দলের শ্রেণীক্রোধ বাস্তব।

বালক দলের ঘরে ফেরার মুখেই গল্পের অভিমুখ নতুন বাঁক নিয়েছে। প্রায় জীবন্ত ফেলে দেওয়া শিশুগুলিকে শকুন ভক্ষণ করে বলেই ছেলেদের শকুনের প্রতি ক্ষোভ। কিন্তু যাদের লোভের শিকার হয়ে শিশুগুলোর মাতৃকোল বিজড়িত স্নেহভূমির পরিবর্তে গর্তে খানা - ডোবায় তেঁতুলতলায় ঠাঁই জোটে; তাদের নিশ্চিত সন্ধান জেনেও নিজেদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিতের মুখে ঠেলে দিয়েই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থেকে বালক দল অন্ধকারের বুকে আত্মসমর্পণ করেছে। প্রতীকধর্মী গল্প শকুন। রূপকের আড়ালে তিনি অনেক কিছুকে প্রতিকায়িত করতে চেয়েছেন। আইয়ুব খানের মদতপুষ্ট তৎকালীন পূর্ব

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাকিস্তানের জোতদার জমিদার ক্ষমতালিপ্সু শ্রেণী পশ্চিম পাকিস্তানের দালালি করতে গিয়ে, গোপন ছদ্মবেশে স্বার্থসিদ্ধি করতে বসে বাংলাদেশকে (অধুনা) ভাগাড় সমতুল্য ক্ষেত্রভূমিতে পর্যবসিত করেছে। উন্মত্তের মত ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন অবতরণের যে ক্ষেত্রভূমি মানুষ নিজেই তৈরি করেছে সেই ভাগার সমতুল্য ক্ষেত্র অন্ধকারের প্রেক্ষাপটেই সৃষ্টি। এই অন্ধকারের প্রেক্ষাপট হল দেশভাগ; যা কোন স্বচ্ছ ধারণা থেকে সৃষ্টি হয়নি। তার ফলে তার মূলে অন্ধকার চির বিরাজমান।

গল্পকার বলেছেন 'শকুন শকুনের মাংস খায় না'[১০] স্বাভাবিক চেতনার জগতে পৌঁছে থেকেই আমরা এই প্রবাদ বাক্য গুলোর সঙ্গে জীবনের সাযুজ্য খুঁজে ফিরি। 'কাক কাকের মাংস খায় না'/'শকুন শকুনের মাংস খায় না' - এই প্রবাদ বাক্য গুলো থেকে আমরা এই ধারণায় পৌঁছায় যে, কাক বা শকুনকে কেন্দ্র করে এই প্রবাদ বাক্যগুলো রচিত হলেও এই প্রবাদ বাক্যগুলোর অন্তরালে মানবজাতির কোন অর্ধস্ফুট কলঙ্কময় অধ্যায় লুকিয়ে আছে। এই প্রবাদ বাক্য গুলোর সৃষ্টিকর্তা মানবজাতি। মানুষই নিজের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে এর জন্ম দিয়েছে। কারণ প্রবাদ বাক্য গুলো মানব জাতির জীবন অভিজ্ঞতারই ফসল। মানবজাতির বর্বর লোভের শিকার হয়ে কত জাতি, কত সভ্যতা ধ্বংসের মুখে পর্যবসিত হয়েছে তার সাক্ষী ইতিহাস। মানুষ উন্নত জীব এই পৃথিবীতে তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দী মানুষ নিজেই। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সভ্য জাতির যে অমানবিকতা প্রকাশ পায়, সেই নগ্ন রূপকে প্রকাশ দিতে গিয়ে গল্পকারকে বলতে হয় 'শকুন শকুনের মাংস খায় না'।[১১]

স্বাধীনতা পরবর্তী, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতির লড়াইয়ের শেষ হয়নি। ঘাতক দালালরা নির্মূল হয়নি। তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতির মূলকে ছিন্ন করার। তাদের আহ্বানে বিশ্বপুঁজিবাদ উন্মত্ত শকুনের মতো অর্ধস্ফুট দেশের ওপর শিকারের লোভে হানা দিয়েছে। দেশভাগের ফলে শাসক শ্রেণীর অন্তরদ্বন্দ্ব, ক্ষমতার লোভের শিকার হয়েছে সাধারণ মানুষ। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই থেকে গেছে। আর বন্ধ্যা প্রান্তরে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। স্বাধীনতার ফল সাধারণ মানুষ খুব একটা ভোগ করতে পারেনি। হতাশা ছাড়া, অন্ধকার ছাড়া তাদের জীবনে কিছুই নেমে আসেনি। তাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নেওয়ার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন উন্মত্তের মতো ছুটে এসেছে। তার ফলেই তাদের ফ্যাকাসে বিবর্ণ চেহারা সমাজের সামনে নগ্ন। অবাঙালির অত্যাচারে আর পাশবিক নির্যাতনে বাংলার প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে শুকনো হাড়। শকুনের পিছু পিছু বাংলার সেই বন্ধ্যাত্ব রুক্ষ প্রান্তরে ক্ষুধার্ত ছেলের দল পৌঁছে গেছে। শকুনের উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে তারা শকুনটিকে হত্যা করেছে। কিন্তু শকুনের মৃত্যুর পরেই যে প্লট গল্পকার আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে তার ফলে সমাজের কুৎসিত নগ্নরূপ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

গল্পকার দ্বিতীয় আখ্যানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন সমাজের প্রকৃত শকুনের কখনোই বিলুপ্তি ঘটে না । নব নব রূপে শকুন পৃথিবীতে বার বার হানা দেয়। এই নব নব রূপে অত্যাচারের শিকার মানুষ আর তার সাক্ষী ইতিহাস । ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে বাঙালির অস্তিত্ব লোপাট করতে চেয়েছে একদল ক্ষমতালিপ্সু শকুন। কিন্তু সেই অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেও মানবজাতির অস্তিত্ব যে টিকে আছে তারই জায়গানের ফসল সাহিত্য। প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের অভিমত অনুযায়ী বলা যেতে পারে আমাদের শিকড়ের মূল যেখানে প্রোথিত তার সন্ধান পরবর্তী প্রজন্মের মনে গ্রথিত করে দিতে হবে। কারণ তারাই আমাদের পরবর্তী সংস্কৃতির ধারক এবং ঐতিহ্যের বাহক। পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সেই শিকড়ের মূলের সন্ধান দাতা সাহিত্য। তাই সাহিত্যের হাত ধরেই আমরা সেই শিকড়ের সন্ধানে ধাবমান। আমরা জানতে পেরেছি নানা নির্যাতন শিকার করেও বাঙালি জাতি বন্ধ্যা প্রান্তরে দাঁড়িয়েও অস্তিত্বের সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। দেশভাগ দিশেহারা বাঙালিকে উদ্ভ্রান্ত করলেও বাঙালিকে ছিন্নমূল করতে পারেনি। নানা প্রতিকূলতার প্রতিরোধ করে বাঙালি বারবার নিজে সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কাল তারই সাক্ষী।

জাতি গত ঔপনিবেশিক শোষণের প্রস্তুতি পর্বে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটিয়ে উপনিবেশিক শোষণের একটা অনুকূল ও মুক্তক্ষেত্র তৈরি করাই পাকিস্তানি শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিল। বাঙালিকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সেই জাতির মর্মমূলে আঘাত হানার জন্য শোষক শ্রেণী বাংলা ভাষার উপর আঘাত হানে। ভাষা জাতির প্রাণ। মুখের ভাষা কেড়ে নিলে জাতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অন্তরেই শুকিয়ে মরে। জাতির শিকড় ছিন্ন হয়ে গেলে সেই জাতি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়। নিজের শিকড় নড়ে যায়, আত্মবিশ্বাস টলে যায়। তখন শুরু হয় ব্যক্তির অন্তর বিচ্ছিন্নতা। 'শকুন' গল্পে তারও প্রতিচ্ছবি লেখক আমাদের সামনে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছে।

> "সবাই সবাই-এর থেকে সাবধান হয়ে ক্যানেলের পাড়ে বসলো। একে অপরের দিকে তীব্র চোখে তাকাচ্ছে। তারপর নিজের হাতে চিমটি কাটছে।"[১২]

সেই শিকড় ছেঁড়া জাতির প্রতিচ্ছবি তৎকালীন বাংলাদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিকায় এঁকেছেন হাসান আজিজুল হক।

অন্ধকারের ক্যানভাসে অজস্র অন্ধকারের চিত্র এঁকে গল্পকার পাঠককে এক গভীর অন্ধকারে পর্যবসিত করেছেন। তবে শুধু অন্ধকারই নয় আলোর তীব্রতাও যে আমাদের পথভ্রান্ত করে সেই সত্যকে গল্পকার আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন দিনের আলোয় আবরনহীন ভাবে। তাই দিনের চড়া আলোয় গল্পকার আমাদের যে অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, তা আরো সজীব, আরো জীবন্ত। সমাজব্যবস্থার যে অন্ধকারের ছবি এঁকেছেন সেই অন্ধকারের সৃষ্টি অন্ধকারের উৎস হতে। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও গল্পকার এক চিলতে আলোর সন্ধান দিয়েছেন অন্ধকারের মধ্যেই বালক দলের হাতে শকুন হত্যার মাধ্যমে। আসলে গলিত পচনশীল সমাজে ব্যক্তির অসহায়তা ও অস্তিত্বহীনতা থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ও নতুন স্বপ্নের বীজ বপনের সৃষ্টিকর্তা হাসান আজিজুল হক।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের শিকার হয়ে জীবনের মূলে প্রোথিত শিকড় ছিঁড়ে ১৯৫৪ সালে হাসান আজিজুল হককে পূর্ববাংলায় চলে যেতে হয়। সাহিত্যের আঙিনায় ঘোরাফেরা করেই তিনি সেই শিকড়ে ফেরার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন। তাই তার জীবনের মূলে গঠিত সেই শিকড়ের টানই তার অজস্র রচনায় প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে। শাহাদুজ্জামানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাসান আজিজুল হক জানিয়েছিলেন –

> "মানুষ বয়স বাড়লে বুঝতে পারে কৈশোরের দৈর্ঘ্য। কারণ সমস্ত জীবনের দৈর্ঘ্য একদিকে এবং কৈশোরের দৈর্ঘ্য অন্যদিকে রাখলে পাল্লা কৌশোরের দিকেই ভারী হবে। তাই ওই দেশ থেকে আসার পর আমি যখন নিজের মনটাকে খুঁজতে গিয়েছি তখন যে স্মৃতি, যে দেশ, যে প্রকৃতি মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটি যে দেশটি ছেড়ে এসেছি, সেই দেশেরই।"[১৩]

তাই সেই দেশের মাটি মানুষ তার লেখায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে।

'ছোট গল্পে থাকা না থাকা' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন –

"আমি একেবারে নিজের ভিতরে ডুব দিয়ে লেখক হওয়ার ইচ্ছের উৎসটাতে হাত দিতে চাইছি।"[১৪]

সেই উৎসের সন্ধানে নেমেই তিনি নিজের শিকড়ে ডুব দিয়েছেন; যে শিকড় তিনি কৈশোরে গেঁথে এসেছিলেন পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ পটভূমিতে। সেই গ্রামীণ পটভূমিতে তিনি পদচারনা করেছেন শিকড়ের সন্ধানে। তার প্রথম গল্প তারই নামান্তর। শৈশবের সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই শকুন গল্পের আখ্যান বস্তু গড়ে তুলেছিলেন।

> "১৯৬০ সালে কলম থেকে এক টানে বেরুল 'শকুন' নামের একটি গল্প। এক টানেই গল্পটা লেখা বলব। শাস্ত্রবিরোধী গল্প বলা যেতে পারে, আবার গল্পের কলাকৌশল জানা নেই বলে যেমন তেমন করে লেখা গল্পের মত একটা - কিছু বলা যেতে পারে। তবে গল্পটিতে অভিজ্ঞতার খুব ঘনিষ্ঠ অনুসরণ আছে। সেদিক থেকে আমাকে তৈরি করে নিতে হয়নি কিছু কল্পনা করারও তেমন কিছু ছিল না নিজের শৈশবের এক অভিজ্ঞতা বিচিত্র ছবি আঁকা পর্দার মতো।"[১৫]

'শকুন' গল্পের আখ্যান লেখকের কল্পনার ডানায় ভর করে উড়ে চলেছে তা নয় বরং তার শিকড় লেখকের শৈশব ভূমিতেই প্রোথিত। কাঁটা তারের বেড়ায় আহত হয়ে রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে ব্যক্তিসত্তা ও জাতিসত্তার সন্ধানে ভ্রাম্যমান লেখক সাহিত্যের জগতে পদার্পণের বিষয়ে আহরণে শৈশবের সেই গ্রামীণ বাংলার পটভূমিতেই অবতীর্ণ হয়েছেন। এ যেন তার নিজের শিকড়ে ফেরা। নিজের শিকড় থেকে আহরিত রসে জারিত করেছেন তাঁর সাহিত্যের আঙিনা।

সেই শিকড়ের সূত্র ধরেই যে তিনি জাতির ছিন্নমূল সত্তার শিকড়ের সন্ধানে তার সাহিত্যের সমগ্র ক্ষেত্রভূমি জুড়েই বিচরণ করেছেন, তা তার অভিমত থেকেই স্পষ্ট –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "লিখবই কিন্তু আঁকড়ে ধরার যে কিছু নেই। আমার শাস্ত্র নেই, গ্রন্থ নেই, নমুনা নেই, একটা কোন তৈরি বিধি সামনে হাজির নেই। কোন সূত্র জানা নেই, কোথাও কোন পরম্পরার চিহ্নমাত্র নেই। অথচ চেতনা স্থির - নিবদ্ধ করে দেখতে পায় ভিতরে আকাশ - মাটি মোটেই শূন্য ফাঁকা নয়। ... সমস্তটাই মানুষের পরিপূর্ণ। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম... লিখতে গেলে লিখতে হবে এই অস্পষ্ট আবছা অসংগঠিত রীতি - প্রণালীমুক্ত আলোকিত কিম্বা অন্ধকার - ঢাকা মানুষ পরিপূর্ণ আকাশ - মাটির ভিতরে থেকেই।"[১৬]

লেখকের এই বক্তব্য অতীব তাৎপর্যপূর্ন। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বাংলা সাহিত্য জগতে প্রবেশের পূর্বে লেখকের সামনে এমন কোন শাস্ত্র বা এমন কোন গ্রন্থ তিনি খুলে গল্প রচনায় হাত দেননি যাতে ছোট গল্পের নির্দিষ্ট নিয়ম নমুনা লিপিবদ্ধ থাকে ফলে নির্দিষ্ট সূত্র মেনে কোনরকম পরম্পরা বজায় রাখার পথে পাড়ি দেওয়ার বালাই তার ছিল না প্রথম থেকেই তার স্বাধীন চেতনা মুক্ত ডানা মেলে আকাশ পথে যাত্রা করেছেন। যে আকাশ সমস্তটাই মানুষ পরিপূর্ণ। এই মানুষ অবশ্যই মাটির মানুষ (সাধারণ মানুষ)। সেই মানুষের সন্ধান তিনি দিয়েছেন মাটির ভিতর থেকেই। যেখানে প্রোথিত থাকে জীবনের মূল। যে আকাশ মাটিতে জাতির শিকড় নিবদ্ধ থাকে তার সন্ধানও তিনি দিয়েছেন শকুনের ডানায় ভর করে।

'দুষ্পাঠ্য কররেখা : আমাদের কথাসাহিত্য' প্রবন্ধে গল্পকার হাসান আজিজুল হক জানিয়েছেন - 'সব লেখকেরই অতীতে একটি করে বাল্যকাল আছে, কাজেই লেখক একবার অতীতে ঢুকতে পারলে বাকি কাজটা তাঁর জন্য খুবই সহজ হয়ে যায়' সেই সহজ কাজটাই তিনি করেছেন। সাহিত্যের জগতে পদার্পণের বিষয় হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছেন নিজের শৈশবে সংগঠিত এক কাহিনীকে।

> "আমার শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে ঠিক যেমন যেমনটি দেখেছিলাম, হুবহু সেইরকম করেই লিখেছি; গল্পের শুরুতে যেমন এক সন্ধ্যায় কতগুলো ছেলের বসে থাকার বর্ণনা আছে, অমনি করে আমরা বসে ছিলাম, অমনি করেই একটা শকুন এসে পড়ে গিয়েছিল আর আমরা হই হই করে তার পেছনে মাঠের উপর দিয়ে, গ্রামের গলিখুঁজি দিয়ে তাড়া করে ছুটেছিলাম এবং গল্পের শেষাংশে যা আছে – ওই রকম ঘটনা সত্যি ঘটেছিল।"[১৭]

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'শকুন'কে সাহিত্যের ভূমিতে প্রতিস্থাপনের মূল তিনি সংগ্রহ করেছেন নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত কাহিনী থেকেই। সেই কাহিনীই তাকে সাহিত্যিক খ্যাতি এনে দেয়। তাঁর প্রথম গল্পেই আকাশ ছোঁয়া খ্যাতির পিছনে লুকিয়ে আছে এক মজবুত বুনিয়াদ।

আজ যে তিনি বিশাল বটবৃক্ষ হয়ে সাহিত্যের জগতে নানা ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং ঝুড়ি স্থাপন করে মাটি আঁকড়ে শিকড় গেঁথেছেন, তার সেই প্রথম শিকড় গাঁথার সূচনা নিজের শিকড়ের গল্প দিয়েই। তার সেই শিকড়ের গল্পই গল্পের শিকড় হয়ে তাকে বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত করেছে। যে পথে তিনি প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলেন, সাফল্যের চূড়ায় উঠেও সেই পথ যে তিনি কখনোই পরিত্যাগ করেননি, তা লেখকের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। 'ছোটগল্পে থাকা না থাকা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন –

> "তবে আগাগোড়া, 'শকুন' গল্পের সময় থেকেই, একটা পথ কখনো ছাড়িনি। অভিজ্ঞতার অনুবাদ করব। অভিজ্ঞতার বাইরে যাব না। তাকে সামনে রেখেই কল্পনা উড়বে।"[১৮]

সাহিত্যের আঙিনায় পা দিয়েই ছোটগল্পের জগতে যে শিকড় তিনি গেঁথে গেলেন সেই শিকড়ের মূল লেখকের শিকড় মাটি থেকেই উদ্ভূত।

Reference:

১. হক, হাসান আজিজুল, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথা প্রকাশ, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ১২
২. তদেব, পৃ. ১৫
৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, কথাপরিসর বাংলাদেশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, পৃ. ৪০

৪. তদেব, পৃ. ৩৯
৫. হক, হাসান আজিজুল, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথা প্রকাশ, কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ১২
৬. তদেব, পৃ. ১৩
৭. তদেব, পৃ. ৬১
৮. তদেব, পৃ. ৮৪
৯. তদেব, পৃ. ১২
১০. হক, হাসান আজিজুল, *গল্পসমগ্র ১,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১১০০, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ১৮
১১. তদেব, পৃ. ১৮
১২. তদেব, পৃ. ১৬
১৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, কথাপরিসর বাংলাদেশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, পৃ. ৫০
১৪. হক, হাসান আজিজুল, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথা প্রকাশ, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ৭৫
১৫. তদেব, পৃ. ৭৬
১৬. তদেব, পৃ. ৮৩
১৭. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, বাংলা ছোটগল্পের দিকদিগন্ত, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৬, পৃ. ৬৪৬
১৮. হক, হাসান আজিজুল, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথা প্রকাশ, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ৭৬

Bibliography:

হক, হাসান আজিজুল, *গল্পসমগ্র ১,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১১০০, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৮